ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের সঙ্গে *জন-অরণ্য*-র দৃশ্য মিলে যাওয়ার কথা লিখেছেন। একটি সরকারি দপ্তরের পরিবেশ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, "এ তো 'জনঅরণ্য'র পুনরাবৃত্তি। ওখানে ছিল নারী। এখানে টাকা ও নারী দুই-ই সমান ভাবে বিনিময়যোগ্য।" আইনজীবীর পেশায় কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা আসায়, তাঁর বাবা প্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে বলেছিলেন, ছেলে 'ভাগ্য'র জোরেই করে খাচ্ছে। এই উক্তিতেও তাঁর মনে পড়ে যায় *জন-অরণ্য* ছবিতে সোমনাথের বাবার উৎকণ্ঠা। আর একবার তো নিঝুম দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে— কণ্ঠে লাস্য বিলোল কটাক্ষের মুখোমুখি... "ভেবেছিলাম মানিকদাকে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে আসি... কিন্তু সাহসে কুলোয়নি।"

বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণে পূর্ণ এ বই, কিন্তু তা বিবৃত হয়েছে এক নির্মোহ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। লেখক যেন উপলব্ধি করেছেন, জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই... পথ তাঁর একান্ত নিজস্ব।

জন-অরণ্য মুক্তি পাওয়ার পর সত্যজিৎ রায় ঘোষণা করেছিলেন, 'যাক তুমি উৎরে গেছ'। *জন অরণ্যে* পড়তে-পড়তে বারবার মনে হয়, জীবনের কাছ থেকে খুব বেশি কিছু চাননি প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, সৎ ভাবে আত্মমর্যাদায় বাঁচতে চেয়েছেন, সেই পরিক্রমায় জীবনও তাঁকে যেন মুচকি হেসে বলেছে, 'যাক তুমি উৎরে গেছ'।

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার মুখ আমরা বিস্মৃত হয়েছি দীর্ঘকাল, একজন জীববিজ্ঞানী তাঁর দৃষ্টিতে সেই দুরবস্থার ভাষ্য রচনা করেছেন।

ফসিল সংস্কৃতির জীবন্ত দলিল

মা-মাটি-মানুষ শব্দবন্ধের মতো প্রকৃতি শব্দটাও হালফিল বহু ব্যবহারে ঝ্যালঝেলে হয়ে গেছে। শব্দটার আজও দরকার পড়ে অবশ্য বহুতল আবাসন [illegible]পন লেখার সময়, [illegible]নো হয়, ক্রেতা ফ্ল্যাট/বা[illegible]ছেন না, অধিকার করছেন একটুকরো অবিমিশ্র প্রকৃতি। প্রকৃতির একটা নির্মিত সম্মোহক রূপ এখনও আমাদের মগজ দখল করে থাকে সম্ভাব্য ভ্রমণের স্থান নির্বাচনের সময়। কিন্তু প্রকৃতই যা ছিল 'প্রকৃতি', মাটি তথা মা, আমাদের জৈবসংস্কৃতির ভিত, তার অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত। যেটুকু আছে তা নেহাত দৃষ্টির আকস্মিক বিহ্বলতা— আর-একবার তাকান, কিছু পাবেন না। সব থেকে বড় কথা, আমাদের মন থেকে তাকে নির্বাসন দেওয়ার কাজটা আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে। সেতুর অবশেষ হিসেবে রয়ে গেছে বিভূতিভূষণের, রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি যা পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য উদ্ধৃত হয় এবং ফ্রেমবন্দি ছবি হয়ে ওঠে। যেমন বিভূতিভূষণ: "মড়িঘাটা কি বাজিতপুরের ঘাট থেকে নৌকো করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত — দেখতে পাবে দুধারে পলতেমাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, টোপাপানার দাম, বুনো তিৎপল্লা লতার হলদে ফুলের শোভা, কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি-বাচড়া-বৈঁচি গাছের ঝোপ..." (*ইছামতী*)। আজ এমনকি গ্রামাঞ্চলের শতকরা কতজন এই গাছগুলোকে মনে রেখেছেন, বা ঝোপঝাড় থেকে তাদের শনাক্ত করতে পারেন? পারেন না কারণ এগুলিকে আমরা কোনওদিন আচরণীয় সংস্কৃতির অঙ্গ মনে করিনি।

বিচ্যুত স্বদেশভূমি: বাংলার জৈব সংস্কৃতির লুপ্তাবশেষের সন্ধান
দেবল দেব
ধ্যানবিন্দু ও বসুধা
কল-৩৫ । ৫৫০.০০

বলা যেতেই পারে, ক্ষতি কী? আমগাছ তো আমরা এখনও চিনি, কাঞ্চন আর রক্তকরবী বাড়িতে লাগাই, যা জীবনসংশ্লিষ্ট নয় তাকে আগলে বসে রইব কত আর। এই নিরিখে বিভূতিভূষণের কলমে যশোরের নদীতীরের বর্ণনায় উদ্ভিদকুল যেমন, তেমনই আজকের যশোর রোডের ধারে থাকা মহীরুহগুলোও জীবনের সঙ্গে আর জোড় বেঁধে নেই। বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ। দেবল দেব-এর বইটি সেই বিচ্ছেদের একটা ছবি তুলে ধরল। ঝাপসা আবেগ-মাখা সাধারণীকরণ সম্বল করে নয়, বরং এক-একটা উদ্ভিদের, শস্যের, প্রাকৃতিক ক্ষেত্রের সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, কয়েক দশকের নিজস্ব গবেষণা আর ইতিহাস-চর্চার মধ্য দিয়ে। একজন বিজ্ঞানীর কলমে কোনও চূড়ান্ত অবজেকটিভ আলোচনা কতটা বুক-মোচড়ানো হতে পারে তার এক দৃষ্টান্ত দেবলের বইটি। তা এটাও দেখাচ্ছে যে, এই লুপ্ত উপাদানগুলো আদতে আমাদের কাছে কত প্রাসঙ্গিক। এবং তা মানুষ-প্রকৃতি বিভাজন রেখার ওপারে বসে থাকা নিখাদ উইল্ডারনেসও নয়।

সে কারণেই দেবল উল্লেখ করেন জৈব সংস্কৃতির কথা, যে-সংস্কৃতিতে ধরা থাকে কয়েক হাজার ভ্যারাইটির ধান। সেগুলি মানুষেরই সৃজন। বহু হাজার বছর ধরে নানা অঞ্চলের মানুষ ধানের এক-একটা বিশেষ গুণ নির্বাচন করে সেগুলির জন্ম দিয়েছিল, সবুজ বিপ্লবের ঢেউ আজ তাদের উপড়ে ফেলে দিয়েছে।

বইটি যে-বিষয়গুলো উপজীব্য করে এগোয় সেগুলোর একটা সাধারণ পরিচয় এরকম: একটি শস্য— ধান; কিছু বৃক্ষ, যা বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল কিন্তু আজ হয় বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির মুখে। কিছু বনজ উপকরণ— ফুল-ফল-পাতা থেকে, কন্দ ও ছত্রাক থেকে ছোট ছোট বন্য প্রাণী যেমন ইঁদুর— এই বাংলার নানা প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করা গ্রামের মানুষের ক্ষুধা মিটিয়ে এসেছে সেগুলি, শরীর অসুস্থ হলে নিরাময় এনেছে, মিটিয়েছে জীবনের আরও শত প্রয়োজন কিন্তু এখন উন্নয়নের স্টিমরোলারের নীচে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চাপে বিলুপ্ত হতে বসেছে। সেই সঙ্গে দেবল সামনে এনেছেন ঠাকুরপুকুর আর ব্রহ্মস্থান-দেবস্থানের প্রসঙ্গ। ভারতের প্রায় সমস্ত এলাকার গ্রামীণ মানুষরা কোনও প্রথাগত শিক্ষা ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ছাড়াই প্রাকৃতিক উপাদান[illegible] সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুভব করেছিল[illegible]ত থেকেই যদিও তারা সংগ্রহ করেছে বে[illegible]র যাবতীয় উপকরণ, তার পাশাপাশি সে সবের সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য কিছু কিছু আরণ্যক ক্ষেত্র আর জলাশয়ে আরোপ করেছিল পবিত্র/দৈব/ অলৌকিক মহিমা— হয়তো সজ্ঞান নয়, হয়তো প্রজন্মবাহিত অভিজ্ঞতা তাদের দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়েছিল। ক্ষেত্র ও জলাশয়গুলি এক-এক জায়গায় এক-এক নামে পরিচিত, কিন্তু ভূমিকায় এক; মানুষের নিজের অস্তিত্ব এগুলির সঙ্গে জোড়া ছিল। আজ সেই ক্ষেত্রগুলো মুছে গেছে, বা যাচ্ছে, দ্রুত। এলাকার স্থাননামে তার কিছু স্মৃতি হয়তো রয়ে যাচ্ছে কেবল। যেমন টিটাগড়ের বড়ামস্তান, যেমন কলকাতার ঠাকুরপুকুর।

দেবল দেখিয়েছেন, কেবল ধানের ভ্যারাইটিগুলোকে ফিরিয়ে আনাটাই কী ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের কাছে, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কট যখন আমাদের ঘাড়ের ওপর, যখন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক আর প্রার্থিত ফল দিতে পারছে না, বিশেষ করে ভূগর্ভের জলের ভাণ্ডার যখন গভীর পাতালে নেমে গেছে, 'শস্যপাত্র' নামে খ্যাত এলাকাগুলো প্রায় মরুভূমি

এখানে ওখানে এখনও জৈব সংস্কৃতির লুপ্তাবশেষ রয়ে গেছে, কিন্তু মানসিক বিচ্ছেদ দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠছে

হয়ে যাচ্ছে।

দেবলের হিসাবে প্রায় ১,১০,০০০ ভ্যারাইটির ধান ছিল গোটা ভারতে। আজ সাকুল্যে হয়তো ৬০০০ প্রজাতি পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যেত এমন প্রজাতিগুলোর মধ্যে ৫২৬টা প্রজাতিকে দেবল তাঁর গবেষণাগার বসুধা-য় (কোনো সরকারি পৃষ্ঠপোষণা ছাড়া কেবলমাত্র শুভানুধ্যায়ীদের অর্থানুকূল্যে চালিত, জানাচ্ছেন দেবল। আগে এটি বাঁকুড়ায় ছিল, নাস্তরিত হয়েছে ওড়িশার রায়গড়ে) রেখেছেন।

ভাদু, কৃষ্ণবট, সীতাপত্র, ভর্ণা, পিড্রা: এগুলো এক-একটা গাছের নাম যেগুলি একদিন হয়তো সুলভ ছিল, তার প্রমাণ বাংলার লোকাচারে, লোকগানে এদের উপস্থিতি, কিন্তু আজ প্রকৃতিতে সেগুলো বিরল, প্রায় বিলুপ্ত। এই গাছগুলোর ভাগ্য সত্যিই প্রশ্নচিহ্নিত। সাম্প্রতিক এক আন্তর্জাতিক বৃক্ষ সমীক্ষায় ধরা পড়েছে পৃথিবীতে ১৭৫১০টি, ভারতে ৪১৩টি গাছ আজ বিলুপ্তির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। বাঁকুড়ায় পাওয়া একটি ভাদু গাছ— শ্রীদেবের বিচারে যেটি ছিল প্রকৃতিতে ভাদু গাছের শেষতম নমুনা, সেটিকেও অতীতের বহু অনুরোধ, আয়োজন ও প্রচার অগ্রাহ্য করে কেটে ফেলে গ্রামেরই এক ব্যক্তি— উদ্দেশ্য তার দোকানের শ্রীবৃদ্ধির অন্তরায় দূর করা। তবে, তার আগেই নেহাত টিস্যু কালচার করে সে গাছের দু'টি চারা দেবল লাগিয়েছিলেন ওড়িশায়, সেগুলিই এই গাছের শেষতম বংশপ্রদীপ।

দুর্গাপুর-বাঁকুড়া পথের ধারে পূত পুষ্করিণী হিসেবে খ্যাত এক জলাশয়ের জল সরাসরি পান করতেন স্থানীয় মানুষেরা। পরীক্ষা করে দেবল দেখেছিলেন কিছু বন্ধু অণুজীবের সৌজন্যে জলটি ওই চরিত্র পেয়েছে। এই জৈব সমন্বয় তৈরি করা যায় না, দীর্ঘ সময়ের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় কোনও কোনও জলাশয়ে। কিন্তু উন্নয়নের ড্রাগন একদিন তার ওপরেও নিশ্বাস ফেলল, দেবল ও তাঁর সহকর্মীদের সমূহ প্রচার ও অনুনয় নস্যাৎ করে পুকুরের জল ছেঁচে ফেলা হল। এর পর জল হয়তো ফিরবে কিন্তু সেই জৈব সমন্বয় আর ফিরবে না।

একটির পর একটি ঠাকুরপুকুর, থানের জঙ্গল, অপরিচয়ের আড়ালে চলে যাওয়া এক-একটি বৃক্ষ নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলাফল দেবল তুলে ধরেছেন এই বইতে, দেখিয়েছেন কেমন করে ব্যাপ্ত অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে বাংলার প্রাকৃতিক সম্পদ, একদা-প্রাণবন্ত আমাদের সংস্কৃতির জিয়নকাঠিগুলি জীর্ণ ও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

তিনটে বিশেষ বার্তা অনুচ্চ স্বরে বইটিতে উপস্থিত। এক, যা কিছু প্রাচীন ও লোকবিশ্বাসে ধৃত, তার সবই 'কুসংস্কার' নয়, তা নিয়ে আগ্রহী হওয়া মানে যুক্তিবাদ ত্যাগ করা রিয়ে না থেকে আঞ্চলিক লোকাচার- সর

দেশ

সম্পাদকীয় বিভাগ

'দেশ' পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ বিষয়ক লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি: গল্প প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনির শব্দসীমা ৩০০০ থেকে ৪০০০ শব্দ। ভ্রমণ-বিষয়ক লেখার সঙ্গে ফোটোগ্রাফ থাকতে হবে। কবিতা অনূর্ধ্ব ২০ লাইন (প্রতি মাসে সর্বাধিক দু'টি কবিতা পাঠানো যেতে পারে)। ইউনিকোড ব্যবহার করে ডিজিটাল ওয়ার্ড ফাইল হিসাবে লেখা পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অবশ্য হাতে লেখা বা টাইপ করা লেখাও আমরা গ্রহণ করি। সে ক্ষেত্রে প্রতিপৃষ্ঠার একদিকে লিখবেন। মূল পাণ্ডুলিপির একটি কপি নিজের কাছে রাখবেন। পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় প্রেরকের নাম-ঠিকানা-ফোন বা মোবাইল নম্বর ইংরেজিতে লেখা আবশ্যক। খামের উপরে লেখার প্রকৃতি (গল্প/কবিতা/প্রবন্ধ ইত্যাদি) অবশ্যই উল্লেখ করবেন। প্রেরিত রচনা সম্পূর্ণ মৌলিক হওয়া বাধ্যতামূলক। পূর্বপ্রকাশিত রচনা গ্রহণ করা হয় না। ডিজিটাল ফাইল পাঠান ই-মেলে (E-mail ID: desh@abp.in)। প্রেরিত রচনা বিবেচনা ও মনোনয়নের জন্য কমপক্ষে ৮ মাস সময় প্রয়োজন। লেখা মনোনীত হলে চিঠি/ ই-মেল দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ভেতর থেকেও খুঁজে নেওয়া চলে মানুষের জীবনাভ্যাস জাত সত্যকে, যা হয়তো আজও শিক্ষণীয়।

দুই, বাংলার সংস্কৃতি হল সামূহিক অংশীদারিত্বের সংস্কৃতি। প্রান্তিক মানুষজন যে-অরণ্য থেকে, যে মাঠময়দান-পুষ্করিণী থেকে জীবিকা সংগ্রহ করেন তার মালিক কেউ নয়, তা সকলের। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডেও এমনটাই চালু ছিল, অন্তত পশুচারণ ভূমির ক্ষেত্রে। আজ ভারতে এমনকি নদীও টুকরো টুকরো দৈর্ঘ্যে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ব্যক্তি মালিকের হাতে, অরণ্যভূমিতে বনবাসী মানুষের অধিকার আইনত স্বীকৃত হলেও নানা সংশোধনী বিধিনিষেধের বেড়াজালে তা প্রতিদিন ক্ষীণ হচ্ছে। অরণ্য আজ খনিমালিকের। যে-দেবস্থানটি গ্রামের মানুষরা আগলে রেখেছিল বহু শতাব্দ, তার মালিক কে এ প্রশ্নটাই অবান্তর। এই সামূহিক অংশীদারিত্বের অন্য দিকও আছে।

দেবল লিখছেন, বাংলার অতীত কৃষিবিজ্ঞানী অর্থাৎ গ্রাম্য চাষিরা এই যে হাজার হাজার ধানের প্রজাতি তৈরি করেছিলেন তার কোনওটির সঙ্গে নির্মাতা মানুষ বা গোষ্ঠীর নাম জুড়ে নেই, সবকিছুতেই সামূহিক অংশীদারিত্বের ছাপ। সে কারণে, দেবল লিখছেন, "আমার শুভানুধ্যায়ী কৃষিবিজ্ঞানীরা যখন আমার নিজের উদ্ভাবিত... ধানের জাতগুলো রেজিস্ট্রি করতে পরামর্শ দেন, তখন আমি তাঁদের ধন্যবাদ দি[illegible] অপারগতা জানাই। ...তাঁরা [illegible] আমি চলমান সামূহিক কৃষি-সং[illegible] অংশ হয়ে গেছি। আমার উদ্ভাবিত বীজগুলো চাষীদের দেবার পর তাঁরা নিজের জমিতে পরীক্ষা ক'রে যখন সন্তোষ প্রকাশ করেন, বছর বছর সেগুলো চাষ করতে থাকেন, তখন আমি আমার দেশের প্রাচীন সামূহিক কৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে ধন্য হয়ে যাই।"

তৃতীয় বার্তাটি অবশ্য অনুচ্চ নেই, দেবল বিস্তারিত লিখেছেন। তার নির্যাস এই: বাংলা তার সাংস্কৃতিক মূল থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর মূল থেকে বিচ্ছেদের পরিণাম বিনাশ। পুথি-কেতাব ছিল না কিন্তু আদিবাসী সংস্কৃতি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে বহু হাজার বছর ধরে, কারণ তা মূল থেকে বিচ্যুত হয়নি। "কিন্তু সংস্কৃতি যখন ফসিল হতে শুরু করে, তখন দেখা যায় সেই সমাজের লোককথার ঝাঁপি প্রায় শূন্য... নিজের প্রতিবেশের উপাদানগুলোর নাম এবং তাদের সাংস্কৃতিক মূল্য কেউ আর মনে করতে পারছে না, নিজের ভাষার অনেক শব্দের সঠিক প্রয়োগ কেউ আর করতে পারছে না, করলেও সেটা কানে লাগে ফসিলায়িত শব্দের মতো..."। আরও বড় কথা হল, ট্র্যাডিশনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে উদ্ভাবন সম্ভব হয় না: "ট্র্যাডিশন শুধু প্রাচীন স্থাবর ভাবাদর্শ আর প্রথার সমষ্টি নয়"— বৈপরীত্য নয়, আসলে অন্যোন্যক সম্পর্ক আছে এ দুয়ের মধ্যে। সৃজন কোনও ফসিলের কম্মো নয়।

আরও একটা বিশেষত্ব, বইটি যথার্থ মাল্টিডিসিপ্লিনারি চর্চার ফসল। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি ও সর্বোপরি বিজ্ঞান— নানা স্তর থেকে আলো পড়ে অপর স্তরগুলির ওপর। ধানের নানা প্রজাতির নামচয়নে শব্দের মাধুর্য আমাদের পুলকিত করে, আমরা ধানের উৎপত্তির ইতিহাস জানি, জেনে নিই ধানের বিশ্বজোড়া নানা নামের মূল লুকিয়ে আছে তামিল ভাষায় ধানের প্রতিশব্দে, ধানের জঙ্গলের সঙ্গে জড়ানো লোকবিশ্বাস ও লোককথার সন্ধান পাই, ভাদু গাছের বৈজ্ঞানিক পরিচয় জানার জন্য দেশ থেকে বিদেশে দেবলের অন্বেষণ গোয়েন্দাকাহিনির মতো ঠেকে।

প্রশ্ন হল, অতঃ কিম? এই বই কি কেবলই বিষাদলিপি? নাকি এটি কোনও ভাবে পথ দেখায় আমাদের? আশাবাদী হতে বাধা নেই, যদিও বইটির একটি অধ্যায়ের শিরোনাম ('দাও ফিরে সে অরণ্য: নেবে কে?') নকল করে বলতে ইচ্ছে হয়, পথ দেখতে চায় কে? তবু, লক্ষ না করে পারি না, বইয়ের উপশিরোনামে দেবল উল্লেখ করেন 'লুপ্তাবশেষ'। বুঝে নেওয়া যায়, বিচ্ছিন্ন ভাবে এখনও কিছুটা বেঁচে আছে, যদিও তার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক-মানসিক অবস্থার দূরত্ব বিপুল এবং তা ক্রমশ বাড়ছে, সেতুবন্ধ না হলে তা আর ফিরবে না। লোকসংস্কৃতি আর আধুনিক সাহিত্যের মিলনে চটজলদি প্রেসক্রিপশন হয়তো কাজের কথা নয়, তবু সেটা খুঁজে দেখার মতো একটা পথ হয়তো বা। আরও জরুরি প্রকৃতির গা থেকে পণ্যবিক্রেতার সাজ খসিয়ে তাকে আটপৌরে উপলব্ধিতে টেনে আনা। প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ উৎসবে টেনে আনা মানুষজনকে, যা শেষ পর্যন্ত বিকিকিনির মঞ্চ হয়ে উঠবে না। এই অভিলাষের সঙ্গে সম্ভবত উন্নত-অনুন্নত বৈষম্যের কোনও সম্পর্ক নেই, শিল্পোন্নত জাপান এখনও তার জৈবসংস্কৃতিকে ঘিরে নানা উৎসব সাজায়। তবু, শেষ প্রশ্ন, চায় কে? আমাদের সাংস্কৃতিক কাণ্ডজ্ঞানের দৌড় তো ধরণী/সরণি-র চৌকাঠ অবধি এবং ব্যক্তিমুনাফাই পরম নির্ণায়ক। বাকি সব কপালের তিলক মাত্র।

যুধাজিৎ দাশগুপ্ত

বইয়ের জানালা

কাব্য বিশ্লেষণ

জয় গোস্বামীর *সূর্য পোড়া ছাই* কাব্যগ্রন্থটি ক্ষীণতনু অথচ রহস্যময়। বহুস্তরীয় দ্যোতনা, স্বয়ংপ্রভ চিত্রকল্পে অনন্য। অরূপ আস সম্পাদিত **সে কাব্য অনেক: জয় গোস্বামীর সূর্য পোড়া ছাই** গ্রন্থে আছে জয় গোস্বামীর এই কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় গুহ, সোমক রায়চৌধুরী, রবিশংকর বল, রূপক চক্রবর্তী, প্রমুখের আলোচনামূলক নিবন্ধ। প্রকাশক তাঁতঘর।

অন্য/ The Other

অন্য/ The Other পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রয়াত শঙ্খ ঘোষ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। আছে শঙ্খকৃত ব্রেশট-এর কবিতার অনুবাদ, চিঠি, নাট্যসমালোচনা ও তাঁকে নিয়ে রচনা। পাশাপাশি আছে সৌমিত্র চট্টো[illegible] অনূদিত ব্রেশট-এর কবিতা, তাঁর [illegible] নিবন্ধ এবং সাক্ষাৎকার। সঙ্গে সৌমিত্রর নাট্যজীবন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ। সম্পাকমণ্ডলী বিভাস চক্রবর্তী, দত্তাত্রেয় দত্ত প্রমুখ।

সায়ক নাট্যপত্র

মেঘনাদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত **সায়ক নাট্যপত্র**-এর এই সংখ্যায় আছে এই সময়ের আটজন নাটককারের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বক্তৃতা ও আলোচনা। পাশাপাশি একটি ক্রোড়পত্রে আছে এই আটজন নাটককার সম্পর্কে ভূমিকা, তাঁদের জীবনপঞ্জি ও নাট্যকৃতি সম্পর্কে লেখা। লিখেছেন চন্দন সেন, দেবাশিস মজুমদার, তীর্থঙ্কর চন্দ, মনোজ মিত্র প্রমুখ।